মডেল টেস্ট-এর উত্তরমালা

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

মডেল টেস্ট- ০১

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	N	৩	L	৪	M	৫	N	৬	N	৭	L	৮	M	৯	K	১০	K	১১	M	১২	L	১৩	M	১৪	N	১৫	M
	১৬	L	১৭	L	১৮	L	১৯	K	২০	M	২১	L	২২	K	২৩	K	২৪	M	২৫	K	২৬	N	২৭	M	২৮	L	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্প্রতি বাংলাদেশের নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়।

খ ঐতিহাসিক হেরোডোটাস সর্বপ্রথম খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তার গবেষণাকর্মের নামকরণে Historia শব্দটি ব্যবহার করেন, যার আভিধানিক অর্থ হলো সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা।

তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস হলো যা সত্যিকার অর্থে ছিল বা সংঘটিত হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা ও লেখা। হেরোডোটাসই প্রথম ইতিহাস এবং অনুসন্ধান এ দুটি ধারণাকে সংযুক্ত করেন। ফলে ইতিহাস পরিণত হয় বিজ্ঞানে, পরিপূর্ণভাবে হয়ে ওঠে তথ্যনির্ভর এবং গবেষণার বিষয়ে।

গ তথ্যছক 'ক' এ ইতিহাসের স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে।

ইতিহাস জ্ঞান অর্জনের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা। এর রচনা ও উপস্থাপনার পদ্ধতিও ভিন্ন। ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলে এ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রথমত: সত্যনিষ্ঠ তথ্যের সাহায্যে অতীতের পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত: ইতিহাসের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মানবসমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক তথ্যনির্ভর বিবরণ।

তৃতীয়ত: ইতিহাস থেমে থাকে না, এটি গতিশীল এবং বহমান। যে কারণে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিকযুগ সন তারিখ ব্যবহার করে ভাগ করা কঠিন। আবার পরিবর্তনের ধারাও সব দেশে একসঙ্গে ঘটেনি।

চতুর্থত: ঘটে যাওয়া ঘটনার সঠিক বিবরণ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাও ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। তবে ঘটনার নিরপেক্ষ বর্ণনা না হলে সেটা সঠিক ইতিহাস হবে না।

তথ্যছক 'ক' এ উল্লেখ করা হয়েছে, রচনা ও উপস্থাপনার পদ্ধতি ভিন্ন, সত্যনিষ্ঠ্য তথ্য, গতিশীল এবং বহমান। যা ইতিহাসের স্বরূপকে নির্দেশ করে।

ঘ জ্ঞান চর্চার শাখা হিসেবে তথ্যছক 'খ' এর গুরুত্ব অপরিসীম– মন্তব্যটি যথার্থ।

ইতিহাসের ব্যবহারিক গুরুত্ব ব্যাপক। মানুষ ইতিহাস পাঠ করে অতীত ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। ইতিহাস দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় বলে ইতিহাসকে বলা হয় শিক্ষণীয় দর্পণ। ইতিহাস পাঠ অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে, ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ইতিহাসের জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে। ভালোমন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারার কারণে মানুষ তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে। এটি পাঠ করলে ভালোমন্দের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, যা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সাহায্য করে। ফলে জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ থাকে।

তথ্যছক 'খ' এ ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জ্ঞান চর্চার শাখা হিসেবে ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরীয় বিজ্ঞানীরা মৃত ফারাওদের দেহ অবিকৃত রাখতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পচন ঠেকানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহকে মমি বলা হয়।

খ রোমান প্রজাতন্ত্রের প্রথম ২০০ বছর ছিল প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস। সমাজে প্লিবিয়ানরা বঞ্চিত শ্রেণি ছিল। অধিকারবঞ্চিত প্লিবিয়ানরা ক্রমাগত সংগ্রাম করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্লিবিয়ানরা কিছু অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়। প্লিবিয়ানদের দাবির মুখে রোমান আইন সংকলিত হতে থাকে। ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্লিবিয়ানরা ব্রোঞ্জপাতে ১২টি আইন লিখিতভাবে প্রণয়ন করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে দু'জন কনসালের মধ্যে একজন প্লিবিয়ানদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে, রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে আসলাম ও তার দল সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করে। এ সভ্যতার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল উন্নত।

সিন্ধুসভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। তাছাড়াও এর অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন। কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলঙ্কার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতমানের শিল্পপণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সেখানকার বণিকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। তাদের সাথে আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

উদ্দীপকের আসলাম ও তার দল একটি সভ্যতাকে বেছে নিয়ে পাকিস্তানে যায়। সেখানে তারা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নগর দুটি পরিদর্শন করে। এ স্থান দুটি মূলত সিন্ধু সভ্যতার। কারণ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বড় দুটি শহর। আর উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ উন্নত ছিল।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি আসলাম ও তার দলের পরিদর্শনকৃত স্থান দুটির অর্থাৎ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল।

সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। ঘরবাড়ি সবই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আসলাম ও তার দলের পরিদর্শনকৃত স্থান দুটির অর্থাৎ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দানসাগর গ্রন্থটি রচনা করেন বল্লাল সেন।

খ সমাজে 'মাৎস্যন্যায়' চরম বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে যে অন্ধকার যুগের সূচনা হয়েছিল তা 'মাৎস্যন্যায়' অভিহিত। এসময় বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও চরম অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। তখন সবল অধিপতিরা মাৎস্যন্যায়ের মতো ছোট ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করতে থাকে। এ অরাজকতা প্রায় একশ বছরব্যাপী চলছিল। এসময় জনগণের দুর্ভোগ আর দুঃখের সীমা ছিল না।

গ প্রদর্শিত চিত্রের নিদর্শনটি প্রাচীন বাংলার পাল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ধর্মপালের সময়কালকে (৭৮১-৮২১ খ্রি.) নির্দেশ করছে।

পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল পিতা গোপালের মতো বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। ধর্মপাল তার শাসনামলে বেশ কিছু বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ও বিহার নির্মাণ করেছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সোমপুর বিহার। নাটোর জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে তিনি এ বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন (ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বিহারের ন্যায় বিশাল বিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত সোমপুর বিহার তার শাসনামলের এক বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।

ঘ না, চিত্রের নিদর্শনটি ধর্মপালের ধর্মীয় গোঁড়ামিকে নির্দেশ করে না।

পিতা গোপালের মতো রাজা ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজ ধর্মের প্রতি বেশ অনুরাগী থাকলেও ধর্মীয়ভাবে গোঁড়া ছিলেন না। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি ভাগলপুরে তার দ্বিতীয় নাম বা উপাধি অনুসারে বিক্রমশীল বিহার বা মঠ নির্মাণ করেন, যা ভারতবর্ষে বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তিব্বতের অনেক ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন করেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এছাড়া তিনি পাহাড়পুরে সোমপুর বিহার নামে আরেকটি বিহার নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সাথে রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তিনি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলতেন এবং প্রতিটি ধর্মের লোকেরা যেন নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতেন। ধর্মপাল নারায়ণের একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য করমুক্ত ভূমি দান করেছিলেন। তিনি যাদের ভূমি দান করেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ। এমনকি ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ।

সুতরাং বলা যায়, ধর্মপাল নিজ ধর্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী থাকলেও ধর্মীয়ভাবে গোঁড়া ছিলেন না।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণে যাওয়ার প্রথাই হলো সতীদাহ প্রথা।

খ মধ্যযুগে হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল বর্ণের লোকদের মেলামেশার অধিকার ছিল না। কারণ সে সমাজে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল।

হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে চারটি বর্ণ ছিল। যার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই তৈরি করেছিল ব্যাপক সামাজিক অসাম্য। তারা এক বর্ণ ও অন্য বর্ণের লোকদের সাথে মেলামেশা বা কোনো বিশেষ সামাজিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারত না। যা ছিল মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজব্যবস্থায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈষম্যপ্রিয় বৈশিষ্ট্য।

গ নিলয়ের বাবা প্রাচীন বাংলার হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিলয়ের বাবা একজন শিক্ষক এবং গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন– বিয়ে, পূজা প্রভৃতি তিনিই পরিচালনা করেন। আর মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী এগুলো ছিল ব্রাহ্মণ শ্রেণির লোকদের কাজ বা পেশা। উক্ত কাজগুলো শুধুমাত্র তাদের জন্যই বরাদ্দ ছিল এবং সমাজে তারা একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করত। তারা ছিল উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু শ্রেণি। সমাজে তারা ব্যতীত বাকি সকল বর্ণের লোকেরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার সম্পর্ক গড়ে তুললেও তথাকথিত রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তারা সব সময় নিজেদের গুটিয়ে রাখত এবং নিজ শ্রেণির মধ্যেই বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কসমূহ নিয়ন্ত্রণে ছিল বদ্ধপরিকর।

সুতরাং বলা যায়, নিলয়ের বাবা সম্পর্কিত আংশিক বর্ণনার আলোকে এটি স্পষ্ট যে, তিনি প্রাচীন বাংলার হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ গোত্রীয় শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছেন।

ঘ উদ্দীপকটি 'প্রাচীন বাংলারই সামাজিক প্রতিচ্ছবি'– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জাতিভেদ প্রথার মতো প্রাচীন বাংলার হিন্দু সমাজ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামক চারটি বর্ণে বিভাজিত ছিল। সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা-পার্বণ করা– এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম। তারা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করত। ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা।

ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ। সবচেয়ে নিম্নশ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করত। ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সব বর্ণের মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করত। সাধারণত এক জাতির মধ্যেই বিবাহ হতো, তবে উচ্চশ্রেণির বর ও নিম্নশ্রেণির কনের মধ্যে বিবাহও চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসব ব্যাপারে কঠোর নিয়ম চালু হয়। এভাবে গোটা প্রাচীন যুগব্যাপী সেকালের হিন্দুসমাজ তাদের এ জাতিবর্ণের স্বতন্ত্র আচরণ টিকিয়ে রেখে চলেছে এবং উদ্দীপকটি এ প্রথারই ইঙ্গিত বহন করে।
অতএব উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, উদ্দীপকটি প্রাচীন বাংলারই সামাজিক প্রতিচ্ছবি– বক্তব্যটি যথার্থ।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি।

খ ইলিয়াস শাহ লখনৌতির শাসক হিসেবে বঙ্গ অধিকার করলেও দুই ভূখণ্ডকে একত্রিত করে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি করেছিলেন।
এসময় থেকেই বাংলার সকল অঞ্চলের অধিবাসী বাঙালি বলে পরিচিত হয়। তাই ইলিয়াস শাহ 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' ও 'শাহ-ই-বাঙালিয়ান' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

গ উদ্দীপকের জামাল সাহেব মধ্যযুগের বাংলার শাসক সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ-এর প্রতিচ্ছবি ।
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সুশাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি শাসনকার্য পরিচালনা ও প্রজা পালনের ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা তিনি একটি সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাদের বিভিন্ন উপাধি প্রদান করতেন। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তার উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। হুসেন শাহ যোগ্য কবি ও সাহিত্যিকগণকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদান করতেন। এ যুগের প্রখ্যাত কবি ও লেখকদের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, পরাগল খান ও যশোরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জামাল সাহেব সুবিদপুর উপজেলার একজন দক্ষ চেয়ারম্যান ছিলেন। তার এলাকায় বিভিন্ন ধর্মের লোকের বসবাস ছিল। তিনি তার উদার চিন্তা প্রয়োগ করে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করেন। এর ফলে সকল ধর্মের লোকদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি তৈরি হয়। তিনি তার এলাকায় তরুণ লেখকদের সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এবং বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন। এর ফলে সাহিত্যচর্চা গতিশীল হয়। যা পাঠ্যপুস্তকের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত জামাল সাহেব মধ্যযুগের বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের প্রতিচ্ছবি।

ঘ "উক্ত শাসকের শাসনকাল অর্থাৎ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনকালকে বঙ্গের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়।" –উক্তিটি যথার্থ।
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন হুসেন শাহি বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি দীর্ঘ ২৬ বছর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি এ বিশৃঙ্খলা দূর করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ১২,০০০ হাবসি হত্যা করে হাবসিদের ক্ষমতা খর্ব করেন। এছাড়া তিনি দেহরক্ষী পাইক বাহিনীর ক্ষমতা বিনাশ করেন। তদস্থলে হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে একটি নতুন বাহিনী গঠন করেন। শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্যম, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। শাসনকার্য পরিচালনায় ও প্রজা পালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি-ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে যোগ্যতা অনুসারে শাসনকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। তার শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। তিনি বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাভাষা ছাড়াও তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার রাজত্বকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ, খানকাহ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। তিনি গৌড়ে একটি দুর্গ ও তোরণ, মালদহে একটি বিদ্যালয় ও একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এ সকল মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, তোরণ হুসেন শাহের স্থাপত্যকীর্তির পরিচয় বহন করে।
এভাবে তাঁর ২৬ বছরের শাসনকালে বঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এজন্য তার শাসনকালকে বঙ্গের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথাই হচ্ছে বর্ণপ্রথা।

খ মহানবি (স)-এর পদচিহ্নের জন্য কদম রসুল বিখ্যাত। কদম রসুল গৌড়ে অবস্থিত।
নসরত শাহ মহানবি (স)-এর পদচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে এ ভবনটি নির্মাণ করেন। এ ভবনের এক কক্ষে একটি কালো কারুকার্যখচিত মর্মর বেদির উপরে হযরত মুহম্মদ (স)-এর পদচিহ্ন সম্বলিত একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকের চিত্রে উল্লিখিত ১নং নিদর্শন অর্থাৎ ষাটগম্বুজ মসজিদটি প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্য শিল্পকে নির্দেশ করে।
ষাটগম্বুজ মসজিদটি বাংলার মুসলমান শাসনকালের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। খান জাহান আলীর সমাধির তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাটগম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। এ মসজিদের গম্বুজ মূলত ষাটটি নয়, সাতাত্তরটি। পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি নির্মিত হয়েছিল। তুর্কি সেনাপতি ও ইসলামের একনিষ্ঠ সাধক উলুখ খান জাহান এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এ স্থাপত্যকর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) স্বীকৃত হয়েছে।

ঘ ১নং চিত্রের নিদর্শনটি হচ্ছে ষাটগম্বুজ মসজিদ এবং ২নং চিত্রের নিদর্শনটি হচ্ছে খান জাহান আলীর মাজার। ইসলাম ধর্ম প্রচারে এ দুটি নিদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম।

খান জাহান আলী ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বারোজন আউলিয়াসহ বাংলায় এসে বর্তমান বাগেরহাট জেলায় বসতি স্থাপন করেন। সমাধির তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাটগম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। অবশ্য এর গম্বুজ সংখ্যা ষাটটি নয়, বরং সাতাত্তরটি। তুর্কি সেনাপতি ও ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সাধক উলুখ খান জাহান এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এ স্থাপত্যকর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রসারে তিনি পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে চিত্র-১ এ উল্লিখিত ষাটগম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে খান জাহান আলীর মৃত্যুর পর বাগেরহাটে চিত্র-২ এ উল্লিখিত তার সমাধিসৌধটি নির্মিত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত এ দুটি প্রতিষ্ঠানই তৎকালীন সময়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ ষাটগম্বুজ মসজিদকে কেন্দ্র করে তৎকালীন মুসলমানগণ এদেশের মানুষের মধ্যে ইসলামি চেতনাবোধ জাগ্রত করেন। ফলে এ অঞ্চলের মানুষেরা দলে দলে ইসলামি পতাকার ছায়া তলে সমবেত হয়। ইসলাম ধর্মের সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে বাংলার অন্যান্য নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও এখানে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এছাড়া খান জাহান আলীও একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্র অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারে ষাটগম্বুজ মসজিদটি নির্মাণ করেন যা পরবর্তীতে তার স্মরণে নির্মিত হয় সমাধিসৌধটি।

সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, খান জাহান আলী এবং তার নির্মিত ষাটগম্বুজ মসজিদ এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের অন্যতম প্রতীক হিসেবে পরিচিত। অতএব বলা যায়, উভয় নিদর্শনই বাংলা ইসলাম ধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারত উপমহাদেশে সর্বশেষে আগত ইউরোপীয় বণিক কোম্পানির নাম ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

খ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হেয় করতে হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত একটি মিথ্যা প্রচারণা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত।

মিথ্যা কাহিনিতে বলা হয় ১৪৬ জন ইংরেজকে ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪.১০ ফুট প্রস্থ একটি ছোট ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। যাঁর কারণে প্রচণ্ড গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ১২৩ জন ইংরেজ সেনার মৃত্যু হয়। এটি ছিল ইংরেজ সেনা হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত একটি সম্পূর্ণ বানোয়াট কাহিনি। এর কোনো ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ মেলেনি।

গ আসাদ সাহেবের প্রথম সিদ্ধান্তটি ইংরেজ শাসনামলের লর্ড কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'কে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় আসাদ সাহেব তার ধানের জমি প্রতিবছর নগদ অর্থের বিনিময়ে লিজ দেন। ফলে কৃষকরা অধিক ফসলের জন্য অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা নষ্ট করছে। তাই তিনি স্থায়িভাবে জমি লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। উদ্দীপকের ন্যায় ইংরেজ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। এ ব্যবস্থায় উচ্চহারে ডাক নিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিলেও সে হারে রাজস্ব আদায় হতো না। তাই তিনি জমিদারদের সঙ্গে একসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। কিন্তু একসালা ব্যবস্থাও সরকার, জমিদার, প্রজা কারও কোনো লাভ হয়নি। পরবর্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৯ সালে দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। তবে এর সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে, কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হবে। ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা দেন।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাটির মতো ইংরেজদের এমন পদক্ষেপের কারণে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়– মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকের ২য় অনুচ্ছেদে দেখা যায়, আসাদ সাহেব তার ব্যবসায় দেখাশুনার ভার ছেলের হাতে অর্পণ করেন। কিন্তু আর্থিক লেনদেন নিজ হাতে পরিচালনা করেন। ফলে প্রকৃত ক্ষমতা তার হাতেই থেকে যায়, যা বাংলার ইতিহাসে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বৈত শাসনের অনুরূপ। দ্বৈতশাসনের কুফলে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়।

দেওয়ানি সনদ লাভের পর রবার্ট ক্লাইভ বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনে একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করেন। কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাব ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হয়। এ অভাবিত ও অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতার ফলে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৭৭০ সালে সংঘটিত এ দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। কোম্পানির মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের ভাষায়, "দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাই গুজব নয়, অতি সত্য।" এ দুর্ভিক্ষে বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মারা যায়। অথচ বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১৭৬৫-৭০ পর্যন্ত যা ছিল দুর্ভিক্ষের বছরও তার কাছাকাছি। এরূপ চরম শোষণের ফলে বাংলার মানুষ হতদরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়ে। অপরদিকে নবাবের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও অর্থ না থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে পড়েন। ফলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমির আলি 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

খ বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও অনেক পিছিয়ে ছিল। তারা সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া তাদের জন্য এক রকম নিষিদ্ধই ছিল। এসময়ও ধর্মের নামে তাদেরকে রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে।

গ জনাব মাহমুদের মধ্যে ইতিহাসের মহান মনীষী হাজী শরীয়তউল্লাহর চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের জনাব মাহমুদ যেমন বিদেশ থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করে গ্রামে ফিরে কুসংস্কারমুক্ত সমাজসংস্কারে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি বা নির্দেশ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করার চেষ্টা করেন। তেমনি বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তউল্লাহও দেশে ফিরে বুঝতে পারেন যে, বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। ইসলাম ধর্মকে কুসংস্কার আর অনাচারমুক্ত করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এ প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি এক ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর এই ধর্মীয় ও সংস্কার আন্দোলনের নামই 'ফরায়েজি আন্দোলন'।

সুতরাং বলা যায়, জনাব মাহমুদের মধ্যে ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্ব হাজী শরীয়তউল্লাহর চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মীয় সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত মনীষীর আরো নানাবিধ কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। হাজী শরীয়তউল্লাহ বাংলার শোষিত, নির্যাতিত, কৃষক, তাঁতি, জেলে প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের হয়ে ব্রিটিশদের শোষণ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

তার ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্থা, বিশ্বাস, তার অসাধারণ সাফল্য নিম্নশ্রেণির জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে জমিদাররা বাধা প্রদান করলে তিনি প্রজাদের অবৈধ কর দেওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন এবং জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নেন। দেশজুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি নুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন। জমিদারশ্রেণি নানা অজুহাতে প্রজাদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে প্রজাদের রক্ষার জন্য তিনি লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কার কার্যক্রম ছাড়াও আরও বহুবিধ জনকল্যাণকামী কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে হাজী শরীয়তউল্লাহ তৎকালীন সময়ে জনপ্রিয়তার শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থি অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাই স্বদেশী আন্দোলন।

খ ১৯২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত বাংলা চুক্তির দুটি শর্ত নিম্নরূপ :

১. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে এ স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হবে।

২. সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে।

গ চিত্র-১-এর ব্যক্তিত্ব হলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের নারী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, তার আসল নাম সূর্য সেন। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য তিনি গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। সূর্য সেনের এই বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা ১৯৩০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিসটিঙ্কশন নিয়ে কোলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ইতোমধ্যে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সাহসী নারী প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামের 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তার সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করেন।

তাই বলা যায়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান বিপ্লবী এ নারী বাংলার সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

ঘ চিত্র-২ এ চিহ্নিত ব্যক্তি হলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, যিনি অখণ্ড বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন না।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। যার ফলে বাঙালি মুসলমানরা বাংলার পূর্বাংশ নিয়ে একটি 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' গঠনের স্বপ্ন দেখছিল। অর্থাৎ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কর্মকাণ্ড অখণ্ড বাংলার পরিপন্থি ছিল, তাই তাকে অখণ্ড বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বলা যায় না।

মূলত অখণ্ড বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৪৭ সালের ২৭শে এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার বক্তব্যে স্বাধীন-সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এর পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসু তার এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি সোস্যালিস্ট রিপাবলিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তবে ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিরেধিতার কারণে সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন সার্থক হয়নি। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ভারতের সাথে যুক্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক নন, অখণ্ড বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক তমদ্দুন মজলিশ হলো ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন।

খ অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনার কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়।

জন্ম থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল ফলে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম দেওয়া হয় ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

গ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের যে বৈষম্যের চিত্র দক্ষিণ সুদানে ফুটে উঠেছে তা হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পর পরই পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কখনই স্বাধীনভাবে বসবাসের সুযোগ পায়নি। দেশটির রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে। তাই পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক হয়। পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য দাতা দেশগুলো যে অর্থ সহায়তা দেয় তার সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় হয়। জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমটিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি। দ্বিতীয়টিতে বরাদ্দ ছিল ৯৫০ কোটি ও ১৩৫০ কোটি রুপি। তৃতীয়টিতে বরাদ্দ ছিল ৩৬% ও ৬৩%।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত সুদানের রাজধানী ছিল উত্তর সুদানের খার্তুমে। তাই সুদানের সামগ্রিক উন্নয়ন উত্তর সুদান কেন্দ্রিক হয়েছে। সুদানের উন্নয়নে দাতা দেশগুলো প্রায় ১০০ কোটি ডলারের সহায়তা প্রদান করে। এর প্রায় পুরোটাই সরকার খার্তুমের উন্নয়নে ব্যয় করে। দক্ষিণ সুদানের এ অবস্থাটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অনুরূপ।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের দক্ষিণ সুদান যেমন অর্থনৈতিকভাবে শোষণের শিকার হয় তেমনিভাবে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়।

ঘ "জন গ্যারাং-এর দাবিতে বঙ্গাবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির চিত্র ফুটে উঠেছে, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বেগবান করেছে" –উক্তিটি যথার্থ।

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এই ছয় দফার মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা, সর্বজনীন ভোটাধিকার, সার্বভৌম প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভা, সহজে বিনিময়যোগ্য দুই প্রকার মুদ্রা, ফেডারেল ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক, বৈদেশিক মুদ্রা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠন। তার এ দাবিগুলো ছিল আমাদের বাঁচার দাবি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জন গ্যারাং সুদান সরকারের কাছে স্বায়ত্তশাসন, নিজেদের সংসদ ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা দাবি করেন যা বঙ্গাবন্ধুর ছয় দফা দাবির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গাবন্ধু এ প্রস্তাবকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' নামে আখ্যায়িত করেন। ছয় দফা দাবির পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। এ দাবিতে পূর্ব বাংলার জনগণ আন্দোলন শুরু করলে আইয়ুব সরকার তা দমনে জেল-জুলুম, নির্যাতন চালাতে থাকে। সরকার ১৯৬৮ সালে বঙ্গাবন্ধুর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিলে এর প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার বঙ্গাবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও ছয় দফা দাবি ছিল মূল ইশতেহার। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং গণহত্যা চালায়। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। নয় মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গাবন্ধুর ছয় দফা দাবি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বেগবান করেছিল।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী প্রধান ভূমিকা পালন করে।

খ মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু হলে বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালিরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায়। শপথ অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম অনুসারে বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর এবং সরকারও পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে।

গ উদ্দীপকের ১নং চিত্রটি অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যের চিত্র। এটি দ্বারা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে বোঝানো হয়েছে।

বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু চেতনার মূর্ত প্রতীক অপরাজেয় বাংলা। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে ৬ ফুট উঁচু বেদির উপর নির্মিত। মূল ভাস্কর্যের উচ্চতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট। বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্রসমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য অপরাজেয় বাংলা নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ এটি নির্মাণ করেন। ১৯৭৩-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এর নির্মাণ কাজ চলে। এ ভাস্কর্যে সাহসী তিনজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুইজন তরুণ রাইফেল হাতে শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আর ঔষধের ব্যাগ কাঁধে তরুণী মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। উদ্দীপকেও এ ধরনেরই একটি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ২নং চিত্রটি জাতীয় স্মৃতিসৌধ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি নির্মিত হয়েছে।

ঢাকার সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এদের অনেকের নামই আমাদের অজানা। তাই এই অজানা শহিদদের স্মৃতি অমর করে রাখার উদ্দেশ্যেই জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধের সাত জোড়া দেয়াল, মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সালের মধ্যেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিহিত। এই সালগুলো হলো ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার ফলেই এবং শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে। আর জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহিদদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মৃতি অমলিন করে রাখার উদ্দেশ্যেই জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।

মডেল টেস্ট- ০২

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	L	৩	K	৪	M	৫	N	৬	N	৭	L	৮	K	৯	N	১০	L	১১	M	১২	N	১৩	K	১৪	L	১৫	M
	১৬	N	১৭	M	১৮	N	১৯	N	২০	K	২১	L	২২	K	২৩	L	২৪	M	২৫	N	২৬	K	২৭	N	২৮	M	২৯	K	৩০	K

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব তাকে ইতিহাসের উপাদান বলা হয়।

খ বিরামহীনভাবে অতীতের ঘটনাপ্রবাহই ইতিহাসের বিচরণক্ষেত্র। তবে ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে ও ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সাহায্য করে।
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ বর্তমানকে সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে। আর এ কারণেই ইতিহাসের ঘটনাবলি অতীতের হলেও একে বর্তমানমুখী মনে করা হয়। ইতিহাস অতীত হলেও তা বর্তমানমুখী এবং বিরামহীনভাবে অতীতের ঘটনা বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তপন সারের বক্তব্যে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে।
ইতিহাস হলো মানবসমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রমাণ ও লিখিত দলিল। ঐতিহাসিক ভিকো মনে করেন, মানবসমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশই হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা মানবসমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সবই ইতিহাসভুক্ত বিষয়। যেমন– শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম, আইন, প্রভৃতি বিষয় সামগ্রিকভাবে যা কিছু সমাজ সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।
উদ্দীপকে দেখা যায়, তপন স্যার নবম শ্রেণিতে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বললেন, মানব সমাজের শুরু থেকে যাবতীয় কর্মকাণ্ড জীবনযাত্রার অগ্রগতি ইতিহাস থেকে জানা যায়। অর্থাৎ, মানবসমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা মানব সভ্যতার উৎপত্তি, অগ্রগতি ও বিকাশই হচ্ছে ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু।

ঘ দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম– বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব অত্যধিক। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে এবং ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের ক্রমবিকাশ ও সভ্যতার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জানতে পারি। আবার অতীতের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ, জাতির সফল সংগ্রাম, গৌরবময় ঐতিহ্যের তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। একই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। এ জন্যই উদ্দীপকের তপন স্যার তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেন। ইতিহাস জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর উত্থান-পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালোমন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারে। ফলে ব্যক্তি তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহর এথেন্সকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাই হেলেনিক সংস্কৃতি।

খ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠে।
অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা অংশ নিত। এতে দৌড়ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকা নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত। বিজয়ীদের জলপাই গাছের ডাল-পাতায় তৈরি মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। প্রতি চার বছর পরপর এই খেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত। এই খেলাকে ঘিরে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শত্রুতার বদলে সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব গড়ে ওঠে।

গ দৃশ্যপট-১ এ 'ক' নামক দেশের সরকার ব্যবস্থার সাথে পাঠ্যপুস্তকের গ্রিক সভ্যতার শাসন ব্যবস্থার মিল রয়েছে। কেননা উদ্দীপকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর আধুনিক গণতন্ত্রের বিকাশে গ্রিক সভ্যতা আমাদের ঋণী করে রেখেছে।
গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বে বহুল প্রচলিত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা। অবশ্য সেই প্রাচীনকালে এথেন্সে যে গণতন্ত্র লক্ষ করা গিয়েছিল তা একদিনে আসেনি। এজন্য অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রথমদিকে গ্রিসে অন্যসব রাষ্ট্রের মতো রাজার হাতেই সব ক্ষমতা ছিল। তিনি অভিজাত আর পুরোহিতদের নিয়ে রাষ্ট্র চালাতেন। কিন্তু এ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একসময় পরিবর্তন হলো। ক্রমে রাজার হাতে থাকা মূল ক্ষমতাগুলো কমে আসে। ক্ষমতাগুলো চলে আসতে থাকে অভিজাতদের হাতে। সময়ের সাথে সাথে এথেন্সের জনগণ অধিকার সচেতন হতে থাকে এবং 'সলোন' নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তি সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। তার সময় গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরি হয়। এরপর আরো কয়েকজন নেতা জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তবে চূড়ান্তভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন পেরিক্লিস। তিনি নাগরিকদের সকল অধিকার প্রদান করেন। নাগরিকরা এসময় প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে অবাধে অংশ নিতে পারত। মূলত এসময় থেকেই বিশ্বে আধুনিক গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' নামক দেশে জনগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করেন। বর্তমান পৃথিবীতে এই ধরনের সরকার ব্যবস্থা বেশ জনপ্রিয়। গণতন্ত্রেও জনগণই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করেন। তাছাড়া বর্তমান পৃথিবীতে গণতন্ত্রই সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা। আর এই গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে গ্রিক সভ্যতা থেকে। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যপট-১ এ 'ক' নামক দেশের সরকার ব্যবস্থার সাথে গ্রিক সভ্যতার শাসন ব্যবস্থার মিল রয়েছে।

ঘ "দৃশ্যপট-২ এর ঘটনা ছিল মিশরীয় সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি"– উক্তিটি যথার্থ।
আফ্রিকার প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নীলনদকে কেন্দ্র করে। মিশরীয় সভ্যতায় নীলনদের অসামান্য অবদানের কারণে ঐতিহাসিকগণ মিশরকে 'নীলনদের দান' বলে অভিহিত করেছেন।

মিশরের নীলনদ আফ্রিকার বিখ্যাত লেক ভিক্টোরিয়া থেকে উৎপত্তি হয়ে নানা দেশের মধ্য দিয়ে মিশর হয়ে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমিগুলো উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল, যা মিশরীয়দের সমৃদ্ধি অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।
অনুরূপভাবে উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এ দেখা যায়, শামীম একটি প্রামাণ্যচিত্রে দেখছিল, একটি বড় নদীর দুই পাড়ে জনবসতি গড়ে ওঠে। প্রতি বছর বন্যায় পলি পড়ে সেখানকার জমি উর্বর হয়। সেই জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক সভ্যতা। এখানে মিশরীয় সভ্যতার কথা বলা হয়েছে। কেননা উদ্দীপকের বড় নদীর মতো মিশরীয় সভ্যতারও মূল চালিকাশক্তি ছিল নীলনদ। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ১৩ শতক পর্যন্ত সময়কাল হলো বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ।

খ বরেন্দ্রী, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রভূমি নামে প্রাচীন বাংলায় অপর একটি জনপদের কথা জানা যায়।
বরেন্দ্র উত্তরবঙ্গের একটি জনপদ। অনুমান করা হয়, পুন্ড্রের একটি অংশ জুড়ে বরেন্দ্রর অবস্থান ছিল। বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং সম্ভবত পাবনা জেলাজুড়ে বরেন্দ্র অঞ্চল বিস্তৃত ছিল।

গ উদ্দীপকের প্রথমাংশে পুন্ড্র জনপদের কথা বলা হয়েছে।
পুন্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুন্ড্র। খুব সম্ভবত: পুন্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুন্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুন্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুন্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুন্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা। পাথরের চাকতিতে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করেন। সেখানে একটি জনপদের বর্ণনায় পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপি পাওয়ার কথা বলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রথমাংশে পুন্ড্র জনপদের কথা বলা হয়েছে।

ঘ বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে শিক্ষকের বর্ণিত জনপদ অর্থাৎ বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী– উক্তিটি যথার্থ।
বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে 'বঙ্গ' নামে একটি রাজ্যও গড়ে উঠেছিল। এ রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া প্রত্নস্থলে। বঙ্গ রাজ্যে পাঁচজন রাজার নামও পাওয়া যায়। তারা হলেন, ধর্মাদীপ্ত, দ্বাদশাদীপ্ত, সুধন্যাদীপ্ত, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব। প্রাচীন শিলালিপি এবং তাম্রশাসনেও (ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের দলিল) এই বঙ্গের বেশকিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কোটালিপাড়া ছাড়াও বিক্রমপুর বঙ্গের রাজধানী হয়েছিল বরে জানা যায়। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী। এ বঙ্গ থেকেই বাংলা ভাষা এবং বাঙালী জাতির উৎপত্তি ঘটে।
সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষকের উক্তিটি যথার্থ।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্যযুগে বাংলার স্থানীয় অঞ্চল প্রধান জমিদারদের মধ্যে যারা সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীর এর রাজত্বকালে মুঘলবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তাদেরকেই ইতিহাসে বারোভূঁইয়া বলা হয়।

খ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কৃতিত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক। জৌনপুরের রাজা খান জাহানের সাথে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। চীনা সম্রাট ইয়াংলো তার দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তিনিও শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে চীনা সম্রাটের নিকট মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ একজন ন্যায়বিচারক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি সাহিত্যিকদের তিনি সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন। মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি কৃতিত্ব দেখান। তাই বলা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম এবং ইলিয়াস শাহি বংশের শেষ সুলতান।

গ দৃশ্যকল্প-১-এ ফসল রক্ষার জন্য মধ্যযুগের শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির কর্মকান্ডের শিক্ষা গ্রহণ করা যেত ।
সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি নিঃসন্দেহে খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী দেবকোট থেকে গৌড় বা লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন। রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়। লখনৌতি নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। তাছাড়া ইওজ খলজি বুঝতে পেরেছিলেন যে শক্তিশালী নৌবাহিনী ছাড়া শুধু অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে নদীমাতৃক বাংলায় রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না। বাংলার শাসন বজায় রাখতে হলেও নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তাই বলা যায় যে, বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজিই নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য এর তিন পাশে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা নির্মাণ করেন। বার্ষিক বন্যার হাত থেকে লখনৌতি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তিনি বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করেন। তিনি রাস্তা নির্মাণ করে সৈন্য ও পণ্য চলাচলের সুবন্দোবস্ত করেন। এ রাজপথ নির্মাণের ফলে রাজ্য শাসন ও ব্যবসায় বাণিজ্যেরই শুধু সুবিধা হয়নি, বরং দেশের লোকের নিকট আশীর্বাদস্বরূপও ছিল। কারণ তা বার্ষিক বন্যার কবল থেকে তাদের গৃহ ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করত।
উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, গত বছর অকাল বন্যায় হাওর অঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কৃষকরা তাদের কষ্টার্জিত ফসল ঘরে তুলতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়েন। এখানে মধ্যযুগের শাসক গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির কর্মকান্ডের শিক্ষা গ্রহণ করলে কৃষকদের ফসল রক্ষা পেত।
সুতরাং বলা যায়, সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির গৃহীত পরিকল্পনা গ্রহণ করে হাওর অঞ্চলের ফসলকে অকাল বন্যার হাত হতে রক্ষা করা যেত।

ঘ "দৃশ্যকল্প-২ এ নিখিল সাহেবের কর্মকাণ্ড যেন নুসরত শাহের কর্মকাণ্ডের মতোই জনহিতকর।"– বক্তব্যটি যথার্থ।
সুলতান নুসরত শাহ তার সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন। জনগণের প্রতি তিনি ছিলেন সহনশীল এবং সহৃদয়। প্রজাদের পানি কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি রাজ্যের বহু স্থানে কূপ ও পুকুর খনন করেছিলেন। বাগেরহাটের 'মিঠাপুকুর' আজও তার কীর্তি বহন করছে। গৌড়ের বিখ্যাত 'কদম রসুল' ভবনের প্রকোষ্ঠে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন। গৌড়ের সুবিখ্যাত 'বড় সোনা মসজিদ বা বারোদুয়ারি

মসজিদ' তার আমলের কীর্তি। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নগর এবং রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে তিনি দুটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার কার্যসমূহের আর একটি নিদর্শন হলো সাদুল্লাপুরে মহান আউলিয়া মখদুম আখি সিরাজউদ্দিনের গৌরবময় মাজারের ভিত্তি। নুসরত শাহের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তার শাসনকালেই শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের বঙ্গানুবাদ করেন। শ্রীধরও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসারের জন্য নুসরত শাহ দেশের বিভিন্ন স্থানে লাইব্রেরিও স্থাপন করেছিলেন।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায়, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে গ্রীষ্মকালে মানুষ প্রচণ্ড পানির অভাবের সম্মুখীন হয়। তাদের পানির অভাব দূর করার জন্য ঐ অঞ্চলের একজন প্রতিনিধি জনাব নিখিল সাহেব জলাধার নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এছাড়াও জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। নিখিল সাহেবের এ কর্মকাণ্ড বাংলার সুলতান নুসরত শাহের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায় প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি যথাযথ।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেহেল সেতুন হলো চল্লিশ খিলানবিশিষ্ট একটি প্রাসাদের নাম।

খ সুলতান জালালউদ্দিনের শাসনকালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি পাণ্ডুয়ার 'এক লাখি মসজিদ'। এর নির্মাণকাল ১৪১৮-১৪২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রবাদ আছে যে, তৎকালীন সময়ে এক লাখ টাকা ব্যয় করে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তাই এটি এক লাখি মসজিদ নামে পরিচিত। এক লাখি মসজিদ নামে পরিচিত হলেও এটি মূলত সুলতান জালালউদ্দিন ও তার স্ত্রী-পুত্রদের কবর।

গ ক্রমিক নং-১-এর স্থাপত্যটি হলো গৌড়ে অবস্থিত আদিনা মসজিদ। বস্তুত মুসলমান শাসকগণ ইসলামের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের শাসনকালকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রাসাদ, মসজিদ, কবর, দরগাহ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদ নির্মাণকে মুসলমান শাসকগণ অতিশয় পুণ্যের কাজ বলে মনে করতেন। স্বাধীন বাংলার মুসলমান সুলতানদের রাজধানী প্রথমে ছিল গৌড়, পরে পাণ্ডুয়া এবং এরপর আবার গৌড়। কাজেই এ দুই শহরেই প্রথমে মুসলিম ঐতিহ্যের স্থাপত্য নিদর্শন গড়ে উঠেছিল। ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দার শাহ 'আদিনা মসজিদ' নির্মাণ করেন। এ মসজিদের উত্তর পাশে সিকান্দার শাহের কবর নির্মিত হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপক-২-এ উল্লিখিত স্থাপত্য নিদর্শনটি হলো বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ। এটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।

বাগেরহাট জেলার 'ষাটগম্বুজ মসজিদ' বাংলার মুসলমান শাসনকালের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। খানজাহান আলীর সমাধির তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাটগম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। অবশ্য এর গম্বুজ ষাটটি নয়, সাতাত্তরটি। পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি নির্মিত হয়েছিল। তুর্কি সেনাপতি ও ইসলামের একনিষ্ঠ সাধক উলুখ খান জাহান এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এই স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) স্বীকৃত হয়েছে। খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত এ ঐতিহাসিক নিদর্শনটি বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান হিসেবে সমাদৃত এবং এ শিল্পের সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। সর্বোপরি বিশ্বসভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে এর স্বীকৃতি এবং একই সাথে সমাদৃত ও গৌরবান্বিত করেছে বাংলাদেশকেও।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজী শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলার মুসলমানদের একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনই হলো ফরায়েজি আন্দোলন।

খ তিতুমিরের ধর্মসংস্কার আন্দোলনে ইংরেজ, জমিদার ও নীলকরদের হাতে নির্যাতিত নিপীড়িত কৃষক, তাঁতিরা দলে দলে যোগ দেয়। ফলে এক পর্যায়ে এ আন্দোলন কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়। তিতুমির হজ পালন করে দেশে ফিরে ধর্মসংস্কারে আত্মনিয়োগ করে। তার এ আন্দোলনে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। বিশেষ করে ইংরেজ সরকার, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের আন্দোলনে যোগ দেয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ বাংলার ইতিহাসে নীল বিদ্রোহকে নির্দেশ করে।

বস্ত্র শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানকার নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলা হয়ে ওঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে নীল চাষ শুরু হয়। নীল চাষের জন্য নীলকররা কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। কৃষকদের নীল চাষের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশপরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না।

নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হতো। পরবর্তীতে কৃষকরা ১৮৫৯ সালে বিদ্রোহ করে– যা ইতিহাসে 'নীল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

তাই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এর চাষিরা যে আন্দোলন করেছিল তার সাথে নীল চাষিদের আন্দোলন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২-এ "উল্লিখিত জমিলার কর্মকাণ্ড বেগম রোকেয়ার কর্মকাণ্ডের যেন প্রতিনিধিত্ব করছে।"– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায়, সুলতানপুর একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। সেখানে নানা ধরনের সামাজিক কুসংস্কার বিরাজমান। ঐ অঞ্চলের মেয়েদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাই মেয়েদেরকে কুসংস্কার ও অন্ধকার অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য জমিলা বেগম তার গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক তেমনি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ একটি অঞ্চল। সেখানে নানা ধরনের সামাজিক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মেয়েদের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। মুসলমান সমাজের মেয়েরা সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য একরকম নিষিদ্ধই ছিল। সমাজে ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। তাই মেয়েদেরকে কুসংস্কার ও অন্ধকার অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য বেগম রোকেয়া ভাগলপুরে একটি প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ সালে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নীত হয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৬ সালে কোলকাতায় আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার নেতৃত্বে সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, কুসংস্কার ও অন্ধকার অবস্থা থেকে নারীসমাজকে মুক্ত করার জন্য উদ্দীপকের জমিলা যেমন ভূমিকা রেখেছিল। তেমনিভাবে বেগম রোকেয়াও নারীসমাজকে অন্ধকার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জমিলার কর্মকাণ্ড বেগম রোকেয়ার কর্মকাণ্ডেরই প্রতিনিধি করছে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি' একটি আত্মঘাতী বাহিনীর নাম, যা মাস্টারদা সূর্য সেন গঠন করেন।

খ চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য মাস্টারদা সূর্য সেন গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই আত্মঘাতী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি'।
এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। 'স্বাধীন চিটাগাং সরকার'-এর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

গ উদ্দীপকের (i) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'ভাগ কর ও শাসন কর' উক্তিটি ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।
লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশকে দুভাগ করার পরিকল্পনা করা হয় এবং ১৯০৫ সালে তা কার্যকর হয়। এই পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুঁড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ। এ প্রদেশগুলোর রাজধানী হয় ঢাকা। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কলকাতা। মূলত শাসনকার্যের সুবিধার্থেই বাংলাকে বিভক্ত করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা সন্তোষ প্রকাশ করলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের (i) নং অনুচ্ছেদের বিষয়টি ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

ঘ উদ্দীপকের (ii) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত গণআন্দোলন অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলন রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা– উক্তিটি যথার্থ।
পলাশি যুদ্ধের প্রায় একশত বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহিদের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দীর্ঘসময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করা, সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সবই এই সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গল পাণ্ডে নামক এক সিপাহি। দ্রুত এই বিদ্রোহ মিরাট, কানপুর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহীতে এই বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের অধিকাংশ সিপাহি শহিদ হন অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল ব্যাপক। এর ফলে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। এরপর থেকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।
উদ্দীপকের (ii) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রথম ব্যাপক ও জাতীয় ভিত্তিক গণ-আন্দোলন। যা ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহী বিদ্রোহকে নির্দেশ করে। যা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালে বাঙালি জাতি যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তাই ভাষা আন্দোলন।

খ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়।
বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কয়েকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গড়ে ওঠে। এটিই ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। এ পুস্তিকায় লিখতেন সাহিত্যিক আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন। তমদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল।

গ উদ্দীপকের ছবি-১ হচ্ছে ১৯৫২ সালের ২৩শে মার্চ নির্মিত ভাষা-আন্দোলনের ১ম স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার। আর ছবি-২ হচ্ছে হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় ১৯৬৩ সালে নির্মিত শহিদ মিনার।
১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ শুরু হয়। জনতা শহিদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে গ্রেফতার হন। যে স্থানে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সেখানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার নির্মাণ করেন। পরে পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙে দেয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহিদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহিদ মিনার ভেঙে দিলে ১৯৭২ সালে সে নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।
পরিশেষে বলা যায়, যদিও ১ম শহিদ মিনার এবং ২য় শহিদ মিনার দুটোই ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে কিন্তু উভয়ের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য হলো ১ম শহিদ মিনারটি নির্মিত হয়েছে ছাত্রদের দ্বারা কোনো ধরনের নকশা বা পরিকল্পনা ছাড়া। যা পুলিশ ভেঙে দিয়েছিল। আর ২য় শহিদ মিনারটি ১ম শহিদ মিনারের স্থলে নির্মিত হয়েছে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশানুযায়ী।

ঘ উদ্দীপকের ছবি-২ এর ঘটনা অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রেরণা। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বা স্বাধীনতার বীজ বপন হয়। যার ফলে সম্ভব হয় ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবি এবং তারই ফলে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছবি-২ এর ঘটনা অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পোড়ামাটি নীতি' বলতে বুঝায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী তার নিজ দেশের বিভিন্ন সম্পদ ধ্বংস করে ফেলা, যেন শত্রুপক্ষ দেশ দখল করলেও ব্যবহারযোগ্য কোনো সম্পদ না পায়।

খ বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা "অপারেশন সার্চলাইট" অভিযান পরিচালনা করে।
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ শুরু করে। জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালানো হয় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। এছাড়া পিলখানা, ইপিআর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ করে নির্বিচার হত্যা চালানো হয়। একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়েরবাজার, গণকটুলি, ধানমন্ডি, কলাবাগান কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। ঢাকার ন্যায় দেশের অন্যান্য শহরেও পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। ২৫শে মার্চের এ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৫০ হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। এ রাতটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সূচনা করে।

গ উদ্দীপকের ভাষণের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতেই বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসভায় বাঙালি জাতির প্রতি দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ নামে পরিচিত। ভাষণে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন-বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরে বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন।
উদ্দীপকের 'ক' দেশে একটি নির্বাচন হয়। কিন্তু পূর্বের শাসকরা নবনির্বাচিত শাসককে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিতে তালবাহানা করেন। ফলে নবনির্বাচিত শাসক এক বিশাল ময়দানে ভাষণের আয়োজন করেন। ভাষণের পর সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ভাষণের সাথে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের আন্দোলন অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়।
১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করায় রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক প্রকার স্বাধীনতার ডাক দেন। কর্মকর্তা, কর্মচারী কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এমতাবস্থায় ১০ই মার্চ সামরিক আদেশ জারি করে সরকার তাদের কর্মস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু এরপরও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসে। আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করে। ২৫শে মার্চ ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় নির্যাতন, গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ। এসবই হয় সামরিক বাহিনীর নির্দেশে।
উদ্দীপকের 'ক' দেশে একটি নির্বাচন হয়। কিন্তু পূর্বের শাসকরা নবনির্বাচিত শাসককে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিতে তালবাহানা করেন। ফলে নবনির্বাচিত শাসক এক বিশাল ময়দানে ভাষণের আয়োজন করেন। ভাষণের পর সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পূর্বের শাসকরা ষড়যন্ত্র করে সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দেন।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আন্দোলন অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র নিরীহ ও স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর পরিচালিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কলঙ্কজনক অভিযানের নাম অপারেশন সার্চ লাইট।

খ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়, যা 'কালরাত্রি' নামে পরিচিত। সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালানো হয় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। এছাড়া পিলখানা, ইপিআর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ করে নির্বিচার হত্যা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকের ১নং ছবির সাথে ২নং ছবি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে নেলসন ম্যান্ডেলার সংগ্রামী জীবনের মিল রয়েছে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান অবিস্মরণীয়। বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামে তিনি ছিলেন অকুতোভয় যোদ্ধা।
অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের পক্ষে। এ জন্য তাকে ২৭ বছর কারাবাস করতে হয়। তারা দুজনেই জীবনের দীর্ঘ সময় কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন। শত নির্যাতনের শিকার হয়েও শত্রুর সাথে আপস করেননি।

ঘ উদ্দীপকের ১ ও ২ নং ছবির উভয় ব্যক্তি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং নেলসন ম্যান্ডেলা আজীবন সংগ্রাম করেছেন দেশ ও দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য– উক্তিটি যথার্থ।
বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারা জীবনের কর্মকাণ্ড আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। ১৯৪৮ ও ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা

হিসেবে স্বীকৃতি দানের অধিকার আদায়ে, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলনে, ১৯৬৬ সালে ছয়দফা কর্মসূচি পেশ, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব প্রদান, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে তিনি ১২ বছরই কাটিয়েছেন কারাগারে। তার বলিষ্ঠ আপসহীন নেতৃত্বের কারণেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আর নেলসন ম্যান্ডেলা সারাজীবন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম করে গেছেন। তার আন্দোলন সংগ্রামের ফলেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান ঘটে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং নেলসন ম্যান্ডেলা আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন দেশ ও দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য– উক্তিটি যথার্থ।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপজেলা ব্যবস্থা জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময় প্রবর্তিত হয়।

খ 'ইনডেমনিটির' আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কাউকে নিরাপদ করা বা কারও নিরাপত্তা বিধান করা।

১৯৭৫ সালের ২০শে আগস্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ এক আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না মর্মে ঘোষণা করা হয়। মানবতাবিরোধী এ কালো আইনটি 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৫' নামে ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ গেজেট'-এ প্রকাশ করা হয়। এ অধ্যাদেশে বলা হয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সরকার পরিবর্তনের জন্য যেসব পরিকল্পনা বা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং যারা এর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধানের জন্য কোনোরূপ আইনের আশ্রয় নেওয়া যাবে না।

গ উদ্দীপকে স্বাধীনতা পরবর্তী নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৯ বছর বাংলাদেশ শাসন করেন। দীর্ঘ ৯ বছরের প্রায় পুরো সময়টাই জনগণ জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, কৃষক সংগঠনসহ এরশাদবিরোধী চেতনা এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হরতাল-অবরোধে প্রশাসনে একপ্রকার স্থবিরতা দেখা দেয়। আন্দোলনের একপর্যায়ে ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর বুকে ও পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' লেখাসহ ঢাকার জিরো পয়েন্টে পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন নিহত হন। এতে জনগণ আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৮৭ সালের ১২ই নভেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ধারাবাহিক আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পাশে অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে ডা. শামসুল আলম খান মিলন নিহত হলে এরশাদবিরোধী আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করে। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের কাছে নতি স্বীকার করে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করেন।

উদ্দীপকের চলচ্চিত্রে দেখা যায়, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ, কৃষক, শ্রমিক বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। যা ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৯০ সালের অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। আর এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র মুক্তি পায়।

অভ্যুদয়লগ্নে বাংলাদেশ ছিল একটি গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে রুখে দেওয়া হয়। এরপর ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশে সামরিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চলে। এই দীর্ঘসময় জনগণ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছে। সবশেষে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আন্দোলনের সফলতা এসেছে এবং গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান হয় স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে। সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে নানা ধরনের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১০ই অক্টোবর প্রহসনমূলক নির্বাচনের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য সুবিধাবাদী, দলছুট বিভিন্ন নেতাকর্মী নিয়ে 'জনদল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এদেশের জনগণ এরশাদের এ ধরনের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড মেনে নিতে পারেনি। ফলে এরশাদবিরোধী দলগুলো বিভিন্ন জোট গঠন করে আন্দোলন করে। হরতাল অবরোধে প্রশাসনে এক প্রকার স্থবিরতা দেখা দেয়।

১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর বিরোধী জোট ও দলগুলোর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে তোলে। এদিন মিছিলে গুলি বর্ষণে ৫ জন নিহত এবং তিন শতাধিক আহত হয়। ধারাবাহিক আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পাশে অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে ড. শামসুল আলম খান মিলন নিহত হলে এরশাদবিরোধী আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ২৭শে নভেম্বর সরকার জরুরি অবস্থা ও কারফিউ জারি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ মিছিল বের করে কারফিউ ও জরুরি আইন অমান্য করেন। রাজপথ চলে আসে জনতার দখলে। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের শহরে। এমতাবস্থায় বিরোধী রাজনৈতিক ৩ জোটের রূপরেখা অনুযায়ী হাইকোর্টের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহবুদ্দীন আহমদকে প্রধান করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের কাছে এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হন। ছাত্র-জনতার এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদের পতনের ফলে দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে এবং গণতন্ত্র মুক্তি পায়।

সুতরাং বলা যায়, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পুনরায় গণতন্ত্র ফিরে পায়।

মডেল টেস্ট- ০৩

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	M	৩	L	৪	L	৫	N	৬	K	৭	K	৮	L	৯	L	১০	M	১১	L	১২	L	১৩	K	১৪	M	১৫	M
	১৬	M	১৭	K	১৮	L	১৯	N	২০	L	২১	L	২২	N	২৩	K	২৪	L	২৫	N	২৬	K	২৭	L	২৮	M	২৯	K	৩০	M

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইতিহাসের জনক বলা হয় হেরোডোটাসকে।

খ ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মধ্যে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ , জীবনী, দলিলপত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এসব লিখিত উপাদানের মাধ্যমে মানুষ ও অতীত সমাজের ইতিহাস জানা সম্ভব। ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান তথা লিপিমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, পুঁথি প্রভৃতি মানবজীবনের অতীত সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না। এ কারণে ইতিহাস রচনায় লিখিত উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। লিখিত উপাদান অতীত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে। তাই ইতিহাসের লিখিত উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ ইতিহাস সাধারণত মানুষ বা মানবসমাজ নিয়ে আলোচনা করে।
ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের শুরু থেকে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তাচেতনা ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারি। কেননা ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো 'মানবসমাজের ধারা বর্ণনা'। ইতিহাস মানুষের অতীত নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাস কেবলমাত্র কিছু ঘটনার সমষ্টি নয়। ঘটনার অন্তরালে যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকে উদ্‌ঘাটন করাই হলো ইতিহাস রচয়িতার দায়িত্ব। যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ তার পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে এগিয়ে চলেছে। একসময় মানুষ ছিল গুহাবাসী। সেই মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করে সমাজ গড়েছে। মানুষের অগ্রগতি আজ পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে ছুটে চলছে। মানুষের এ জয়যাত্রার কাহিনি, তার সাফল্য ও ব্যর্থতার সবকিছুই ইতিহাসের উপজীব্য। ইতিহাস মানবসৃষ্ট সভ্যতা, সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করে। কেননা মানুষ কীভাবে সভ্যতার যুগে এসেছিল এবং কীভাবে তারা সংস্কৃতি প্রত্যয়টি বুঝতে পেরেছিল তাও ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ কীভাবে এগিয়ে চলেছে ইতিহাস তার ধারা বর্ণনা করে। সভ্যতার উত্থান, বিকাশ ও পতন সবকিছুরই নীরব সাক্ষী ইতিহাস। তাই বলা যায়, ইতিহাসই মানবসমাজের বিকাশের ধারা তুলে ধরে।

ঘ লিখিত ও অলিখিত উপাদানের সমন্বয়ের মাধ্যমে অতীতের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নির্মাণ সম্ভব বলে আমি মনে করি।
ইতিহাসের উপাদানসমূহ সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত; যথা– লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান। লিখিত উপাদানের মধ্যে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, জীবনী গ্রন্থ, দলিলপত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতি। অন্যদিকে, অলিখিত উপাদান মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। লিপিমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, পুঁথি ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। এসব উপাদানের মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ ও সমাজের ইতিহাস জানা যায়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান মানবজীবনের অতীত অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই লিখিত উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। ইতিহাস রচনায় ইতিহাসের উভয় উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু লিখিত উপাদান কিংবা শুধু অলিখিত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কেননা একটিমাত্র উপাদান ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না। একজন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে সঠিক ইতিহাস রচনা করা। ইতিহাস কল্পনাবিলাসী কোনো ভাবের বস্তু নয়। এতে আবেগ প্রাধান্য পায় না। তাই ইতিহাসের উৎস হতে হবে যথার্থ ও বাস্তবধর্মী। আর এক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উপাদানের সমন্বয়সাধন একান্ত আবশ্যক। কেননা এর মাধ্যমে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়। সুতরাং বলা যায়, লিখিত ও অলিখিত উপাদানের সমন্বয়ের মাধ্যমে অতীতের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নির্মাণ সম্ভব– উক্তিটি যথার্থ।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয় মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ।

খ ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো।
প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল। প্রায় সমস্ত মিশর নীলনদের পানি দিয়ে গঠিত এবং নীলনদের জলে উর্বর সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা হয়েছে। মিশরে শীতকালে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে এ শুষ্ক মৌসুমে তারা নীলনদের পানি দিয়ে গম, ধান, যব, আখ, তুলা প্রভৃতি মূল্যবান কৃষিজ ফসল চাষ করে। এসব কারণে মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ১নং চিত্রটি রোমান সভ্যতার নির্দেশক। এটি রোমান সভ্যতার অন্যতম স্থাপত্য কলোসিয়ামের চিত্র।
গ্রিক সভ্যতার অবসানের আগেই ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে একটি বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই সভ্যতা রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। তাই এটি রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত। রোমান সভ্যতা প্রায় ছয়শ' বছর স্থায়ী হয়েছিল।
রোমান স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশালতা। সম্রাট হার্ডিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন রোমানদের স্থাপত্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। ৮০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট টিটাস কর্তৃক কলোসিয়াম নাট্যশালা নির্মিত হয় সেখানে একসঙ্গে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারত।
কলোসিয়াম সাধারণত গ্লাডিয়েটরদের প্রতিযোগিতা এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্য কোনো প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত হতো। রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় এই স্থাপনার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল ৮০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট তিতুসের রাজত্বকালে।

ঘ উদ্দীপকের ২ নং চিত্রটি হলো চিত্রলিপি বা অক্ষর। যা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রথমদিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এ লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক বা পবিত্র অক্ষর। মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। সেই কাগজের ওপর তারা লিখত। গ্রিকরা এ কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। এ শব্দ থেকে ইংরেজি পেপার শব্দের উৎপত্তি হয়। এখানে উল্লেখ্য, নেপোলিয়ন মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয় যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত। যাতে গ্রিক এবং 'হায়ারোগ্লিফিক' ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত হায়ারোগ্লিফিক আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু শেষদিকে অতি অল্প সংখ্যক পুরোহিত তা পড়তে পারতেন। ১৮২২ সালে রসেটা প্রস্তর আবিষ্কার এবং পরবর্তী সময়ে থোমাস ইয়ং-এর গবেষণার ফলে হায়ারোগ্লিফিক লিপির প্রায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায়, চিত্রলিপি বা অক্ষর আবিষ্কার প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্বভৌম নরপতি ছিলেন শশাংক।

খ প্রাচীন বাংলার সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎস ছিল। এর মধ্যে নানা প্রকার কর ছিল অন্যতম।

উৎপন্ন শস্যের ওপর বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য করা হতো। যেমন– ভাগ, ভাগে, হিরণ্য, উপরি কর ইত্যাদি। কতকগুলো উৎপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠমাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। দস্যু ও তস্করের ভয় থেকে রক্ষার জন্য কর, ব্যবসায় বাণিজ্য শুল্ক, খেয়াঘাট হতে আদায়কৃত মাশুল ইত্যাদি ছিল সরকারের আয়ের কয়েকটি বিশেষ উৎস। বনজঙ্গল ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ। সুতরাং এটিও রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ছিল। বিভিন্ন রকমের রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।

গ উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সেন বংশের শাসক বল্লাল সেনের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

সেনরাজা বল্লাল সেন ১১৬০-১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। বল্লাল সেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। তার একটি বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তার অবদান অপরিসীম। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থদ্বয় তার আমলের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র লক্ষণ সেন ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তার শাসনামলই ছিল সেন বংশের শেষ সময়। এ সময় তুর্কি বীর বখতিয়ার খলজি বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। লক্ষণ সেন তখন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া আক্রমণ করে দখল করেন। লক্ষণ সেন পালিয়ে যান। এভাবে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশালপুর গ্রামের চেয়ারম্যান মধু বড়ুয়া একজন বিদ্যানুরাগী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ধর্মশাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তার দুটি গ্রন্থ ইতিহাসের ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীতে তার ছেলে মাধব বড়ুয়া কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলেও আরেক চেয়ারম্যানের কাছে পরাজিত হন। উদ্দীপকের এ ঘটনার সাথে সেন বংশের শাসক বল্লাল সেন ও তার পুত্র লক্ষণ সেনের কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন খ্যাতিমান লেখক ছিলেন।

ঘ প্রশ্নে উল্লিখিত উক্ত অবস্থার ফলে অর্থাৎ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় আর একটি নতুন অধ্যায় অর্থাৎ মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসকের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। বখতিয়ার খলজি একজন উচ্চাভিলাষী তুর্কি বীর ছিলেন। তিনি বিভিন্ন চড়াই উতরাই পার হয়ে নিজের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে পেরেছিলেন। বখতিয়ার খলজি বাদউনের শাসনকর্তা হুশামউদ্দিনের অধীনে ভাগবত ও ভিউলি পরগনার জায়গিরদার হন। এ সময় তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকে। এতে চারদিকে তার সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সৈন্যবাহিনীতে অনেকে যোগ দেয়। বখতিয়ার খলজি বিহার জয় করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের দরবারে যান। কুতুবউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তিনি বিহারে ফিরে আসেন। এবার তিনি বাংলার দিকে চোখ দেন। এ সময় বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন লক্ষণ সেন। বাংলায় প্রবেশের জন্য দুটি পথ ছিল। তেলিয়াগড় ও শিকড়িগড় নামে দুটি গিরিপথ দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করতে হতো। বখতিয়ার খলজি প্রচলিত এ দুই পথ দিয়ে না এসে ঝাড়খণ্ডের ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল পথ দিয়ে আসেন। বখতিয়ার খলজি যখন লক্ষণ সেনের প্রাসাদের ফটকের সামনে আসেন তখন তার সাথে ছিল ১৭/১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিক। প্রাসাদ রক্ষীরা মনে করল ঘোড়া ব্যবসায়ী এসেছে। ফলে তারা গেট খুলে দিল। ভিতরে প্রবেশ করেই বখতিয়ার খলজি অতর্কিত আক্রমণ শুরু করেন। অপ্রস্তুত লক্ষণ সেনের সৈন্যরা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। রাজা লক্ষণ সেন এ সময় দুপুরের খাবারে ব্যস্ত ছিলেন। সংবাদ শুনে লক্ষণ সেন পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এভাবে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে। এ শাসন প্রায় ৫০০ বছরের অধিক স্থায়ী হয়েছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল আমলে প্রদেশগুলো সুবা নামে পরিচিত ছিল।

খ মুঘল সুবাদার ইসলাম খান শাসনভার গ্রহণ করে বুঝতে পারেন যে, বারোভূঁইয়াদের নেতা মুসা খানকে দমন করতে পারলেই তার পক্ষে অন্যান্য জমিদারকে বশীভূত করা সহজ হবে।

সেজন্য তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। কারণ মুসা খানের ঘাঁটি ছিল ঢাকার অদূর সোনারগাঁয়। আর মুসা খানকে দমন করার জন্য তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন।

গ লক্ষীচর অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামলের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শায়েস্তা খান ছিলেন বাংলার সুবাদার। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী শাসক। বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও কৃষিক্ষেত্রে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার সময়ে দ্রব্যমূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এছাড়া তার আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার। এ আমলে কৃষিকাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদের উৎসাহিত করতেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লক্ষীচর অঞ্চলের কৃষকেরা কৃত্রিম সার ব্যবহার করে না। নিজেদের উৎপাদিত জৈব সার ব্যবহার করে অল্প খরচে ফসল উৎপাদন করে। উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় বাজারে উৎপাদিত ফসলের মূল্যও কম। ফলে এলাকার জনগণ সচ্ছলতার মাঝে জীবনযাপন করে। যা শায়েস্তা খানের শাসনামলের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে উক্ত শাসকের অর্থাৎ শায়েস্তা খানের শাসন আমলকে মুঘল আমলের স্বর্ণযুগ বলা হয়।" –উক্তিটি যথার্থ।

১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তার শাসনামলে যে সকল কাজের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তান্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ। শায়েস্তা খানের শাসনকাল বাংলার স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র সৌধমালা, মনোরম সাজে সজ্জিত তৎকালীন ঢাকা নগরীর স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তার গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। শায়েস্তা খানের শাসনামলে নির্মাণ করা স্থাপত্য কর্মের মধ্যে ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, বিবি পরির সমাধি সৌধ, হোসেনী দালান, সফি খানের মসজিদ, বুড়িগঙ্গার মসজিদ, চক মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা অন্য কোনো সুবাদার বা শাসনকর্তা ঢাকায় শায়েস্তা খানের মতো নিজের স্মৃতিকে এত বেশি জ্বলন্ত রেখে যেতে পারেননি। বস্তুত ঢাকা ছিল শায়েস্তা খানের নগরী।

তাই বলা যায়, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক দাখিল দরওয়াজা নির্মাণ করেন রুকনউদ্দিন বরবক শাহ।

খ মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য ও টাকা-পয়সার লেনদেন এবং হিসাব-নিকাশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এ সময় ক্রমে ব্যাংকিং প্রথার বিকাশ ঘটে।

এ যুগে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে লেনদেন করা হতো। সমগ্র মধ্যযুগ বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের এরূপ বৃদ্ধির ফলে বাংলার ব্যাংকিং প্রথার বিকাশ ঘটে।

গ উদ্দীপকে বাংলার মধ্যযুগের সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম ও হিন্দু সমাজের সামাজিক রীতিনীতি ও পোশাক-পরিচ্ছদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে অভিজাত মুসলমানগণ পায়জামা ও গোল গলাবন্ধসহ জামা পরতেন। তাদের মাথায় থাকত পাগড়ি, পায়ে থাকত রেশম ও সোনার সুতার কাজ করা চামড়ার জুতা। মোল্লা ও মৌলভীরাও পায়জামা, জামা এবং টুপি ব্যবহার করতেন। গরিব বা নিম্নশ্রেণির মুসলমানগণ লুঙ্গি ও টুপি পরত। মহিলারা কামিজ ও সালোয়ার ব্যবহার করত। অপরদিকে মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু সমাজের পোশাক-পরিচ্ছদে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু পুরুষদের সাধারণ পোশাক ছিল ধুতি। এছাড়া সমাজের অভিজাত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাদর, পাগড়ি ও পাঞ্জাবি ব্যবহার করত। ব্যবসায়ীরা গলায় হার, কানে দুল ও আঙুলে আংটি পরতো।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত দুই বন্ধুর পোশাক-পরিচ্ছদে মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম ও হিন্দু সমাজের পোশাক-পরিচ্ছদের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, মধ্যযুগে বাংলার বস্ত্র শিল্পের জগৎজোড়া খ্যাতি ছিল।

নদীমাতৃক বাংলার ভূমি চিরদিনই প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদে পরিপুষ্ট ছিল। সে যুগে বাংলায় যেমন কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল, তেমনি বস্ত্রসহ কিছু শিল্পের সুখ্যাতি ছিল। মুসলমান শাসনের সময় হতেই বাংলার পাট ও রেশমের চাষ শুরু হয়। যার ফলে মধ্যযুগে বাংলার বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার নির্মিত বস্ত্রগুলো গুণ ও মানের বিচারে যথেষ্ট উন্নত ছিল।

তাই বিদেশে এগুলোর চাহিদা ছিল প্রচুর। নিজেদের ব্যবহারের জন্য রঙিন কাপড় এবং বিদেশে রপ্তানি করার জন্য সাদা কাপড় এখানে তৈরি করা হতো। ঢাকা ছিল মসলিন নামক বিশ্বখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র শিল্পের প্রধান প্রাণকেন্দ্র। ইউরোপে এর প্রচুর চাহিদা ছিল। এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে ২০ গজ মসলিন কাপড় একটি নস্যির কৌটায় ভরে রাখা যেত। পাট ও রেশমের তৈরি বস্ত্রেও বাংলার কৃতিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, সে যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগে বাংলার বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায়।

খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেছেন বলে তাকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন অসামান্য পণ্ডিত ব্যক্তি। কর্মজীবনে প্রবেশের সাথে সাথে তিনি সাহিত্যচর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। শিশুদের লেখাপড়া সহজ করার জন্য তিনি রচনা করেন বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে সহজ করার জন্য তিনি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করেন। তাছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন।

মোটকথা বাংলা গদ্যসাহিত্যের উন্নয়নে তার অসামান্য অবদানের জন্য তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ফাতিমার চরিত্রের সাথে আমার পঠিত পাঠ্যপুস্তকের মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সোনাপুর গ্রামের মুসলমান সমাজের মেয়েরা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া করা মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদের রাখা হতো গৃহবন্দি করে। তখন ঐ গ্রামেরই মেয়ে ফাতিমা নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া করে নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন। তিনি নারীদের করুণ দশা এবং নারী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন বালিকা বিদ্যালয়। যা বেগম রোকেয়ার কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। বেগম রোকেয়া ছিলেন নারীজাগরণের অগ্রদূত। বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সমাজে ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। এরূপ পরিবেশে বেগম রোকেয়া তার বড় ভাই ও বড় বোনের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তার বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম সমাজপতিদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করুণ দশা। তার রচিত 'অবরোধবাসিনী', 'পদ্মরাগ', 'মতিচূর', 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে কোলকাতায় তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপন করেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ফাতিমার চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি বর্তমান নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে উক্ত নারী অর্থাৎ বেগম রোকেয়ার অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে যখন ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। বাংলার মুসলমান সমাজের মেয়েরা অন্যান্য সামাজিক অধিকারের পাশাপাশি শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। এর মূল কারণ ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি। মুসলমান মেয়েদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে সংকল্পবদ্ধ হন নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। তিনি নিজে বড় ভাইয়ের আন্তরিক উৎসাহে উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষালাভ করেন। পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ ও বই লেখার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন অবহেলিত নারীসমাজকে শিক্ষা সচেতন করার চেষ্টা করেন। তার রচনাগুলো ছিল মূলত নারী শিক্ষা ও নারীজাগরণকেন্দ্রিক। তার সেসব লেখনী আজও বাংলার নারীদের প্রেরণা জোগায়।

বর্তমানে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, তা নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার নারী আন্দোলনের পথ ধরে এসেছে। ফলে আজকের দিনে নারীরা দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এমনকি বর্তমানে নারীরা প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে পা রেখেছেন। মেয়েরা আজ কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ তথ্যপ্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখছে। তাছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে নারীরা অধিষ্ঠিত রয়েছে।

অতএব উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, বর্তমান নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বেগম রোকেয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর।

খ অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

প্রীতিলতা মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীর নারী সদস্য ছিলেন। সাহসী নারী প্রীতিলতাকে তার যোগ্যতার জন্য চট্টগ্রাম 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তার সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। তিনি ধরা পড়ার আগে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। প্রীতিলতা বাংলার সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

গ উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবইয়ের ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সাদৃশ্য রয়েছে। নবম শ্রেণিতে ইতিহাস বিষয় পড়াতে গিয়ে শিক্ষক উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা এক মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বললেন নানাবিধ কারণে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম যা পলাশী যুদ্ধের প্রায় একশত বছর পর সিপাহিদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিদ্রোহ জনগণকে সচেতন করে তোলে। ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ছাড়াও বৈষম্যমূলক নীতিই মহাবিদ্রোহের সূচনা করে। রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ব্রিটিশরা একের পর এক রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে থাকে। কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণবঞ্চনা শুরু হয়। জনগণ অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য মহাবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে পদবি এবং বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার ওপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এছাড়া ভারতীয় হিন্দু সৈনিকদের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল ইংরেজরা। আর ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সৈন্যদের জন্য গরু ও শূকরের চর্বিমিশ্রিত 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হলে ধর্মনাশ হওয়ার কথা ভেবে ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যেটি ইতিহাসে সিপাহি বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত।

ঘ "উক্ত বিদ্রোহ অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।"– উক্তিটি যথার্থ।

মঙ্গল পাণ্ডে নামক একজন সিপাহির গুলি ছোড়ার মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ এ বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এ বিদ্রোহ পরবর্তীতে দেশটির স্বাধীনতা ও জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এ বিদ্রোহে যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন। অনেক বিদ্রোহীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে। এ সংগ্রামের সাথে জড়িতদের বেশিরভাগই সিপাহি যুদ্ধে শহিদ হন, বাকিদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, এ বিদ্রোহ শুধু সিপাহিদের বিদ্রোহ ছিল। কোনো কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে, এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, এ বিদ্রোহ শুধু সিপাহি বিদ্রোহ ছিল না, এটি ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক DAC-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি।

খ জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান UNESCO ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

ফলে ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি দেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ শহিদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালি জনগণের গভীর মমত্ববোধ ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিকভাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' নির্বাচনের ফলাফল আমার পাঠ্যপুস্তকের যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটি হচ্ছে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম লীগ শাসক ও তার দোসরদের শোষণের বিরুদ্ধে এক ব্যালট বিপ্লব। বিশেষ করে এ সময় পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের চরম

ব্যর্থতার ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল ও ৫. খিলাফত-ই-রাব্বানি পার্টি মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ২১দফা কর্মসূচি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশ নেয় এবং নৌকা প্রতীকে সর্বমোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় ০৯টি আসন, নির্দলীয় ৩টি এবং খিলাফত-ই-রাব্বানি ১টি আসন লাভ করে।

তাই বলা যায়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এজন্য যে, এ চেতনা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনকে প্রভাবিত করেছিল।

ঘ আমি মনে করি 'ক' নির্বাচনের ফলাফল অপেক্ষা 'খ' নির্বাচনের ফলাফল অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতৃত্বের পরাজয় ঘটে। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তারা বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়।

ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাবাসী স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

<u>৯নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানবিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে যে জোট গঠন করে তাই COP বা Combined Opposition Party.

খ ছয় দফাতে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির কথা ছিল বলে একে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

ছয় দফা কর্মসূচিতে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চাওয়া হয়। ছয় দফা প্রস্তাবে উজ্জীবিত হয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলার জনগণ অকুণ্ঠচিত্তে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা আসে ছয় দফার ঐক্য থেকেই। তাই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে রহমান সাহেবের সাথে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। জনমানুষের সাথে বঙ্গাবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমানের অধিক সম্পৃক্ততা তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের জননেতায় পরিণত করেছিল। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড রুদ্ধ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বারবার তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে। তারপরও বঙ্গাবন্ধুকে এ ভূখণ্ড স্বাধীন করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা যায়নি। ১৯৬৩ সালে বঙ্গাবন্ধু গোপনে ত্রিপুরা গমন করেন। সেখানে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতালায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ও পরবর্তীকালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে তাঁর বৈঠক হয়। সেখানে তিনি শচীন্দ্রলালের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে বার্তা পাঠিয়ে স্বাধীনতা প্রয়াসে সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে ভারতের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। উল্লেখ, ১৯৬৬ সালে বঙ্গাবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন জনমানুষের দাবিতে পরিণত হয়। এদিকে সামরিক বাহিনীতে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণে কয়েকজন বাঙালি অফিসার ও সেনাসদস্য গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগঠিত হতে থাকেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সমগ্র পাকিস্তানে দেড় হাজার বাঙালিকে গ্রেফতার করা হয়। এ ষড়যন্ত্রের জন্য বঙ্গাবন্ধুকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, আসামের জনপ্রিয় নেতা রহমান সাহেবকে বৈষম্যের প্রতিবাদ করায় বিহার সরকার বারবার গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। তারপরও তিনি দমে না গিয়ে আসাম প্রদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এক পর্যায়ে বিহার সরকার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে রহমান সাহেবকে প্রধান আসামি করে। যা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মামলা দায়ের করার অনুরূপ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে রহমান সাহেবের সাথে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে মিথ্যা মামলা আগরতলা মামলার অনুরূপ। আর এই মামলা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের আশীর্বাদস্বরূপ বলে আমি মনে করি।

বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে আগরতলা মামলা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যে উদ্দেশ্যে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করেছিল তা আদৌ সফল হয়নি; বরং এটি আইয়ুব সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। অন্যদিকে বঙ্গাবন্ধুর জন্য এটি ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সংবর্ধনা সভায় তাকে 'বঙ্গাবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। একপর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানের মুখে নতি স্বীকার করে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে তার উত্তরসূরি জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে নির্বাচন হয়। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ধাবিত হয়। এ পরিস্থিতিতে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন এবং মুক্তি আন্দোলনের ডাক দেন। ২৫ মার্চের কালরাতের পর ২৬ মার্চ বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গাবন্ধুর নেতৃত্বে মানুষ জেগে উঠে এবং জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উল্লিখিত মামলা অর্থাৎ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলাটি বঙ্গাবন্ধুকে আকাশচুম্বী জনপ্রিয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। তাই এ মামলা ছিল বঙ্গাবন্ধুর জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবসে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

খ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যার হাত ধরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়, ঘাতকরা তাকেই বুলেটের আঘাতে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে আমরা একটি কৃতঘ্ন জাতিতে পরিণত হয়েছি। আমরা হারিয়েছি কালজয়ী এক ক্ষণজন্মা পুরুষকে। তাই ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় দিন।

গ দৃশ্যপট-১-এ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমকে নির্দেশ করে।
স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করেন এর মধ্যে শিক্ষাখাত ব্যাপক গুরুত্ব পায়। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুনঃনির্মাণ করেন। প্রথমবারের মতো প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। এর ফলে এসব স্কুলে কর্মরত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার শিক্ষকের চাকরিও সরকারি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেন।
উদ্দীপকে দৃশ্যপট-১-এ বলা হয়েছে, অতি বৃষ্টির কারণে পদ্মা নদীতে ভাঙন দেখা দেয়। যার ফলে আশে পাশের ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা এবং একটি কলেজ সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। স্থানীয় একজন সংসদ সদস্য তা পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করেন। উদ্দীপকের অনুরূপ সংস্কারমূলক কার্যক্রম দেখা যায় উপরে আলোচিত স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যপট-১ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমকে নির্দেশ করে।

ঘ দৃশ্যপট–২ স্বাধীন বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিরই প্রতিচ্ছবি– বক্তব্যটি যথার্থ।
তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসার পূর্বে ভুটান ও ভারত ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও তার মিত্রদের বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণায় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র তখনও বিভ্রান্ত। অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মেধা দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের এই শূন্যতা পূরণে সক্ষম হয়েছিলেন।
বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায়ের কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না। বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ প্রায় সব আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করে। এই একই চেষ্টাটি করা হয়েছে উদ্দীপকে বর্ণিত দৃশ্যপট-২ এ। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও দেশের আন্তর্জাতিক সহায়তা আনয়নে দৃশ্যপট-২ এর নীতিরই প্রতিচ্ছবি।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিষ্টীয় সাত শতক থেকে তেরো শতক পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে প্রাক-মধ্যযুগ।

খ প্রাচীন ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে জনপদ গঠিত হয়। প্রাচীন যুগে বাংলা এখনকার মতো কোনো একক ও অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন অনেক ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এসব অঞ্চলের শাসক যার যার মতো শাসন করতেন। বাংলার সেসব অঞ্চলগুলোকে তখন একেকটা জনপদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এভাবেই প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকের ১নং চিত্রে উল্লিখিত নিদর্শনটি প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্র জনপদে অবস্থিত।
পুণ্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। খুব সম্ভবত: পুণ্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।
উদ্দীপকের ১নং চিত্রে প্রদর্শিত চিত্রটি হলো বগুড়ায় অবস্থিত মহাস্থানগড়। উপরের আলোচনায় দেখা যায়, মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ ছিল। সুতরাং বলা যায়, ১নং চিত্রে উল্লিখিত নিদর্শনটি প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদে অবস্থিত।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত জনপদ অর্থাৎ সমতট জনপদটিই প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উন্নত জনপদ ছিল।
পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি সমতটের অবস্থান। সমতটের রাজধানী বড় কামতা এবং দেবপর্বত কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। শালবন বিহার এদের অন্যতম।
এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতি ছিল তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম চর্চাকেন্দ্র। এর নিদর্শনস্বরূপ অনেক বৌদ্ধ বিহার রয়েছে; যেমন– আনন্দ বিহার বা শালবন বিহার, ভোজ বিহার ইত্যাদি। এ সময়ে শালবন বিহার এশিয়ার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়ে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হতো। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং আনন্দ বিহারে এসেছিলেন। তখন বিহারে চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। তাছাড়া এ জনপদ নদী বিধৌত হওয়ায় নৌবাণিজ্যে খুবই প্রসার লাভ করেছিল। যার কারণে এ জনপদের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ছিল সমৃদ্ধিশালী। সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এ জনপদের মানুষ অন্যান্য জনপদ থেকে বেশি সমৃদ্ধিশালী ছিল।
সুতরাং বলা যায়, সমতট জনপদটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উন্নত জনপদ।